আজকের কাগজ

তারিখ 08 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাংলাদেশে সাক্ষরতা ঃ তার বাস্তবায়ন

গীতা দাস

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৭৫.১৮ জন চোখ থাকতে অন্ধ। নিরক্ষর। চামড়ার চোখ থাকতেও সামনে আঁকি ঝুকির বা দাগ কাটা ছাপার কি অর্থ তা জানে না। বুঝে না। সাধারণ জনগণ কোন আজন্ম পাপে- কার অভিশাপে অহল্যার মত পাষাণ হয়ে আছে? চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে আছে?

ঢাকা থেকে এয়ারপোর্ট যেতে ক্যান্টনম্যান্ট এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া দেখা যায়। কিছু জায়গা পরপর কাঁটা তারে ঝুলানো সাইনবোর্ড "নিষিদ্ধ এলাকা" কিন্তু ২৪-৮২% সাক্ষরতার দেশে তা বুঝে কয়জন? না বুঝে যদি নিষিদ্ধ এলাকায় অন্ধের মত কেউ প্রবেশ করতে চায় তবে শাস্তি নিশ্চয়ই অনিবার্য? কারণ এ নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ নিরাপদ নয়। কিন্ত নিরক্ষরতার দেশে কি করে সম্ভব জনগণের জানমালের নিরাপত্তা?

বাংলাদেশের প্রায় সব লোক কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস তো কোন ধর্ম গ্রন্থকে বা কোন গ্রন্থে উল্লেখিত নিয়ম-কানুনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অথচ সে গ্রন্থ কোনদিন নিজে পড়েও দেখেনি। পড়ার মত যোগ্যতাও নেই। শুনে শুনে বিশ্বাস। "যা না দেখি নিজ নয়নে। বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে"।- এ বলিষ্ঠ প্রবাদটি মাথা কুটে মরে। আর না দেখে তথা নিজে না পড়ে বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কারের। যা অনেক অনাচারের জন্যেও দায়ী। আরও বিশ্বাস নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারারই সামিল।

নিরক্ষর লোকের অন্ধ বিশ্বাস আধুনিক গণতন্ত্র চালায়। ফাঁকে ফায়দা লুটে মোষ্টিমেয় কিছু লোক। গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে নিচে পড়ে থাকে। এ গণতন্ত্রের বোবার মত বলার যোগ্যতা নেই বলে অধিকার হারায়। এ গণতন্ত্র ভাগিনার-মামুদের নৌকায় গুন টেনে আসার মত অবস্থা। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে যে গণতন্ত্র-তা সীল মারো ভাই সীল মারো- অমুক মার্কায় সীল মারো-এমনি হুজুগে গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রের আরেক নমুনা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। ক্ষমতাসীনরা বিরোধীদের সম্পর্কে যাচ্ছে তাই, বলছে দর্শনীয় ও শ্রুতি নির্ভর গণমাধ্যমে। বিরোধিরা প্রতিবাদ করছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু সংবাদপত্রের সে ভাষা কতজন পড়তে পারছে? শুনা ও দেখায় তো বাড়তি যোগ্যতা লাগছে না। অর্থাৎ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞানহীন রেখে গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ অসম্ভব তো বটেই পাগলের প্রলাপ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এ বিষয়টি তলিয়ে দেখার দাবি রাখে।

জনগণের জন্যে "ক অক্ষর" নিষিদ্ধ খাদ্য বানিয়ে গণতন্ত্রের মুখে ফাঁকা আওয়াজ বৈ কিছু নয়। আমাদের দেশে লেখাপড়ার পাঠ্যসূচিতে প্রায়োগিক দিকটি উপেক্ষিত বলে জনগণ লেখাপড়ায় আগ্রহী নয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েও রিক্সাচালক। নিরক্ষর ব্যক্তিও রিক্সাচালক। কাজেই অষ্টম শ্রেণী পাসের মূল্য কি? যদিও অষ্টম শ্রেণী পাস রিক্সাচালক সাইন বোর্ড দেখেই রাস্তা চিনে নিচ্ছে— আরোহীকে হয়রানি ছাড়া সঠিক গন্তব্যে বা ঠিকানায় পৌছে দিচ্ছে। তবুও ভাড়ার তারতম্য নেই। পাঠ্যক্রম জীবনভিত্তিকও নয়। যে জন্যে মেয়েটিকে স্কুলে পাঠানোর চেয়ে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে যা যা করতে হবে তা মায়ের কাছে Internee করাই শ্রেয়। নাজেহাল হতে হবে না ভবিষ্যতে।

টেনে উঠে কোনটি কোন স্টেশন তা কাউকে জিজ্ঞেস করলেই পাওয়া যায়। নিজে স্টেশনের নাম পড়তে না পারলেও অসুবিধে নেই। কারণ, অসচেতন বলে আমাদের জনগণ এ পরনির্ভরশীলতায় আত্ম অনুশোচনায় দগ্ধ হয় না। কোন প্রয়োজনীয় ঠিকানার সাইনবোর্ড রাস্তার মোড়ে তীর বা এ্যারো চিহ্ন দেয়া থাকলেও নিরক্ষর ঠিকানা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তির কিছু যায় আসে না। ঠিকানা খোঁজ করতে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ওষুধ খেতে সাহায্য নেয় অন্য কোন ব্যক্তির। এমনি নিজের ব্যক্তিগত চিঠি কাউকে দিয়ে পড়ানো বা কাউকে দিয়ে লিখানোতে গোপনীয়তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। Privacy শব্দটি আমাদের দেশীয়দের অভিধানে নেই। আর Privacy হীন জীবন যে আধুনিকতার পরিপন্থী তা বলাই বাহুল্য।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তি হাজারো সমস্যায় ভোগেন। ১১টি উন্নয়নশীল দেশে পরিচালিত পরীক্ষামূলক বিশ্ব সাক্ষরতা কর্মসূচির এক আন্তর্জাতিক নিরীক্ষায় দেখা গেছে-একজন নিরক্ষর লোককে শিক্ষা দিতে ৭১২০টি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৬৭-৭২ পর্যন্ত এ নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। ২০ বছর পর এ যান্ত্রিকতার যুগে সমস্যা বেড়েছে বৈ কমেনি নিশ্চয়ই। এ দিক থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা কতগুলো সমস্যাকে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি করা হয় বা হয়েছে তা ভেবে দেখার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রইল।

আমাদের কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতাও লেখাপড়ার প্রতি অনীহার জন্যে দায়ী। নিরক্ষর ব্যক্তি শরীরিক শ্রম দিতে দ্বিধান্বিত নন। কিন্তু আমাদের দেশের তথাকথিত মূল্যবোধজনিত কারণে পাশের বাড়ির শিক্ষিত বেকার যুবকটির শাঁখের করাতের মত অবস্থা। না পাচ্ছে চাকরি না আছে ব্যবসা করার মত পুঁজি। না করতে পারে শারীরিক শ্রমভিত্তিক কোন কাজ। আর এ অবস্থা দেখে নিরক্ষর ব্যক্তিটি তার উত্তরাধিকারকে স্কুলে দিতে নারাজ।

হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলা হয়েছিল পছন্দ দিতে পাঁচজন পণ্ডিত নিয়ে পাতালে যাবে? না ১০০ সূর্খ নিয়ে স্বর্গে যাবে? বাহুল্য-রাজা হরিশ্চন্দ্র ১০০ জন সূর্খ নিয়ে স্বর্গে যেতে রাজি হননি। কারণ ১০০ জন সূর্খকে সামলাতে হিমশিম স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করা সম্ভব নয় বলেই হয়তো হরিশ্চন্দ্র তা করেননি। অন্যদিকে পাঁচজন পন্ডিত নিয়ে পাতালে ও স্বর্গরাজ্য রচনা সম্ভব। সে যাই হোক- রাজা হরিশ্চন্দ্র উনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পছন্দ করেছেন। কিন্তু আমরা? আমরা কি পারব নিরক্ষর-অসচেতন জনগণকে নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে? দেশের সার্বিক উন্নয়ন কি সম্ভব এ জনগণকে নিয়ে? সন্দেহ আছে, মনীষীরা বলেন, উন্নয়নের পূর্বশর্ত সচেতনতা। আর সচেতনার পূর্বশর্ত শিক্ষা।

UNESCO এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্যে ব্যবহারিক সাক্ষরতা তথা বয়স্ক শিক্ষার জন্যে সুপারিশ করেছেন- সে সাক্ষরতার তিনটি উপাদন। (১) লেখাপড়া (২) সচেতনতা (৩) সক্ষমতা যেমন, ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। এ লাইনটি আমি পড়তে পারলাম কোনটা ধ, কোনটা ম বা ক্ষ সেটা চিনি। যে কোন স্থানে এর ব্যবহার জানি। তবে সাক্ষরতার তিনটি পর্যায়ের মধ্যে আমি লেখাপড়ার স্তর পার হলাম। দ্বিতীয় উপাদান হলো সচেতনতা। সচেতনতার চারটি স্তর। জানা, বিশ্লেষণ করা, মূল্যায়ন করা ও ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করা। জানা-তথ্য জানলাম যে, ধুমপান স্বাস্থের জন্যে ক্ষতিকর, বিশ্লেষণ করলাম ধূমপানের সুবিধা-অসুবিধা। মূল্যায়ন করলাম সুবিধা বেশি না অসুবিধা বেশি। Plan of Action বা ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করলাম অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম ধূমপান করব না। এ চারটি স্তর পার হয়ে সচেতন হলাম। যখন ধূমপান ছেড়ে দিলাম তখন সক্ষম হলাম। আর এ তিনে মিলে সাক্ষর হলাম। সাক্ষরতা অর্জিত হলো। এ আলোকে বাংলাদেশে দশমিকের পর শতকরা কতজন সাক্ষর পাওয়া যাবে তা বিচার্য বিষয়, কারণ Honesty is the best policy প্যারাগ্রাফ পরীক্ষার খাতায় নকল করে লেখা হচ্ছে। ধুমপান বিরোধী প্রতিবেদন লেখা হয় ধুমপান করতে করতে। স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের সপক্ষে বক্তৃতা দেয়া হচ্ছে বিদেশী পোশাক পরে।

অবশ্য এ মূল্যবোধজনিত অবক্ষয় শধু বাংলাদেশে নয়-নয় শুধু এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের চালচিত্র। সারাবিশ্বেই আজ এ অবস্থা। কথা ও কাজেই মিল নেই। তবুও ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক

"বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা" ৫২-তে রক্ত নিয়েছে। প্রসবোনুখ দুঃখ সয়েছে। কিন্তু আপন হয়েছে মাত্র ২৪.৮২% জনের। এ হারের মধ্যে UNESCO-এর সংজ্ঞার আলোকে যাচাই করতে গেলেতো তা তথৈবচ অবস্থা। অবশ্য বাকিদের মধ্যে লেখাপড়া নামক প্রথম উপাদানটি না থাকলেও সচেতনতা ও সক্ষমতা রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। তবে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সব উপাদানের সমন্বয় ঘটলেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব পরিপূরকভাবে। ছোট বেলা "কৃষ্ণলীলা" গানে শুনেছিলাম। 'অ' অক্ষর মহামন্ত্র কুঠার করিয়া। সংসারের তরুমূল ফেলি দাও কাটিয়া।

সেই 'অ' অক্ষর মহামন্ত্রকে কুঠার করে কবে সাড়ে এগার কোটি জনগণ তেইশ কোটি হাত দিয়ে দারিদ্র্যতা, অভাব, নিরক্ষরতা, তথা অনুন্নয়নের শেকড় উপড়ে ফেলবে সে প্রত্যাশায় রইলাম।

গীতা দাস : কলাম লেখক, একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত।